# এই সংখ্যায়


| | | |
|---|---|---|
| শান্তিনিকেতনে বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপন উৎসব : অনিল কুমার কোনার | | ১ |
| '...অসামান্য শক্তিশালী রাখাল' : কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় রাধাকৃষ্ণ কথা' : মোনালিসা পাল চক্রবর্তী | | ৩ |
| রবীন্দ্র-সাহিত্য সামাজিক সমস্যা | : বিমল কুমার থান্দার | ৬ |
| ''সংগীত ও ভাব'' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ | : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় | ৮ |
| শার্দূলকর্ণাবদানম্ ও চণ্ডালিকা—একটি সমীক্ষা | : শুভেন্দু মণ্ডল | ১০ |
| রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প : একটি পরিক্রমা | : নীহার শুভ্র অধিকারী | ১৩ |
| তুষার রায়ের কবিতা : একটি সমীক্ষা | : রাহুল ঘোষ | ২৩ |
| তোমাকে চাওয়ার ২৫ বসন্তে | : অনির্বাণ দাশগুপ্ত | ২৬ |
| বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প : নানা মাত্রা : হেমন্ত পাল | | ২৭ |
| বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের আখ্যান : একটি অন্বেষণ : পল্লবকুমার সাধু | | ৪১ |
| ধর্মমঙ্গলকাব্যের আধুনিক রূপান্তর ও ভব রায়ের 'ধরমডোমের শূন্যপুরাণ' : প্রবীর কুমার পাল | | ৬৩ |
| শ্রদ্ধেয় কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মরণে গান ফেরিওয়ালা | : ছায়া দাস | ৬৯ |
| কাজরি | : সাধনাবড়ুয়া লাহিড়ী | ৬৯ |
| জানা আছে | : চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় | ৭০ |
| হৃৎ-কথা | : তড়িৎ রায়চৌধুরী | ৭০ |
| বন্ধ চোখের ওপাশে | : মধুমিতা শাশমল | ৭১ |
| চর্যাপদ— ফিরে পড়া | : ভাষান্তর : অমল পাল | ৭১ |
| মরীচিকা | : সুস্মিতা গুহরায় | ৭২ |
| সেদিন | : মেহবুব আলম | ৭৩ |
| বারমাস্যা | : প্রশান্ত চ্যাটার্জী | ৭৪ |
| শব্দখোঁজ | : শ্রীময়ী ঘোষ | ৭৬ |
| শ্রাবণের একদিন | : প্রবীর দাস | ৭৬ |
| আশ্রয় | : সুদর্শনা সেন | ৭৭ |
| আদিম শঙ্খধ্বনির ভিতর | : অঞ্জন দাস | ৭৭ |
| বলিনি তোমাকে | : অতনু শাশমল | ৭৮ |
| অন্তর্গত অক্ষরমালা | : প্রবীরকুমার দেবনাথ | ৭৮ |
| রূপদর্শীর ব্রজদা | : ফাল্গুনী তপাদার | ৭৯ |
| সাহিত্য সৃষ্টি ও পরিবেশ এবং দুটি বই | : ইন্দ্রানী রুজ | ৮২ |
| বরিশালের উপভাষা অঞ্চলের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ : নূর মোহাম্মদ মল্লিক | | ৮৯ |
| 'জাপান-যাত্রী' ও 'জাপানে বঙ্গনারী'— একটি তুলমামূলক পাঠ : সুনিমা ঘোষ ও বরুণ মণ্ডল | | ১০৩ |
| স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত ছোটগল্প : চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালি নারী : প্রহ্লাদ রায় | | ১০৮ |
| কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' : একটি সমীক্ষা : মধুমিতা শাশমল | | ১১৫ |
| হুমায়ুন আজাদ : এক সমকাল সংলগ্ন কবি | : ইয়াসমীন আরা লেখা | ১২৪ |

## হুমায়ুন আজাদ : এক সমকাল সংলগ্ন কবি

ইয়াসমীন আরা লেখা
( বাংলাদেশ )

প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, কিশোর সাহিত্যিক, রাজনীতিক ভাষ্যকার এবং কলাম প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭০ টির বেশি। ধর্ম, প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কারবিরোধিতা, নারীবাদিতা, রাজনৈতিক বক্তব্য এবং নির্মম সামলোচনামুলক বক্তব্যের জন্য তিনি ১৯৮০-র দশক থেকে ব্যাপক পাঠক গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সমপর্যায়ের মেধাবী, সৃষ্টিশীল, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বাগ্মী, দৃঢ় স্বাধীনচেতা, তীক্ষ্ণ, রসবোধসম্পন্ন, ছাত্রবৎসল সম্ভবত কেউ ছিলেন না। অসমামান্য সাহিত্য সৃষ্টি তিনি করেছেন, তাঁর শিশু সাহিত্য অসাধারণ, প্রবন্ধ দুর্দান্ত, গবেষণা খুব উন্নতমানের। তাঁর প্রবন্ধগুলো সম্ভবত বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি ছিলেন একাধারে দুর্বিনীত, শিশুসুলভ, দাম্ভিক, সরল, রাগী, পাগলাটে, সাহসী, অকপট, কঠোর, নেশাচ্ছন্ন, দায়িত্বশীল, স্নেহপ্রবণ, উদার, আত্মকেন্দ্রিক, ক্রুদ্ধ, উদাসীন ও উন্নাসিক।[১]

'অলৌকিক ইস্টিমার' (১৯৭৩), 'জ্বলো চিতাবাঘ' (১৯৮০), 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' (১৯৮৫), 'যতোই গভীরে য়াই মধু যতোই উপরে যাই নীল' (১৯৮৭), 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে' (১৯৯০), 'হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯৩), 'কাফনে মোড়া অশ্রু বিন্দু' (১৯৯৮), 'কাব্য সংগ্রহ' (১৯৯৮) ও 'পেরোনোর কিছু নেই' (২০০৪), কাব্যসমগ্র (২০১২) প্রভৃতি তাঁর কবি প্রতিভার স্বাক্ষর।

বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি হুমায়ুন আজাদ; তাঁর কাব্যসমগ্রে পাওয়া যায় তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আবেগ উপলব্ধি কামনা বাসনা সৌন্দর্যবোধ; পাওয়া যায় বাংলা ভাষার সুস্থতম সৃষ্টিশীল রূপটি। তিনি জনপ্রিয় বিষয়গুলো নিয়ে মাতেননি, মুখর হননি শ্লোগানে; এমনকি প্রথাগত পাঠকেরা যে-অন্তরঙ্গ কন্ঠস্বর শুনে বিহ্বল হ'তে ভালোবাসেন, সে-স্বরেও কবিতার নামে পদ্য দিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করেন নি পাঠকদের। তাঁর কবিতা অপূর্ব অসামান্য চিত্রকল্প, তীব্র আবেগ, পরিস্রুত বাংলা ভাষার মিলন। তিনি সর্বাংশে আধুনিক; তিনি নগর পেরিয়ে এগিয়েছেন প্রকৃতির দিকে, আধুনিকের আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন বহু বছর উপেক্ষিত নিসর্গকে; মৃত্যুবোধ ও ব্যক্তিগত যন্ত্রণার এমন আন্তরিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যার তুলনা সহজলভ্য নয়। হুমায়ুন আজাদের অনবদ্য কাব্য ভাবনা পাঠকদের সুখী ক'রে চলবে দশকের পর দশক।

'অলৌকিক ইস্টিমার' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ এক অসাধারণ কাব্য। এ কবিতায় রোমান্টিক কবির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখানে হুমায়ুন আজাদ রোমান্টিক কবির ন্যায় 'স্নানের জন্যে' কবিতায় লেখেন–

মরুভূমির মতো নদী বয়ে যায় দিকচিহ্নহীন
আমি কি ক'রে ভাসাই নৌকা জলে নামি
স্নান করি
স্নানের যোগ্য জল নেই কোনো নদী সরোবরে।[২]

তাই কবির বিশ্বাস——

নাম জপে কি যে সুখ কতো কাল আগে
বুঝেছিলো রাধা

কেননা নামের শব্দ প্রিয়তমা নাম
অস্তিত্বের আধা
আমি যাকে অস্তিত্বের অংশ ভাবি সে শুধু ধ্বংস করে পুষ্পচন্দ্র [৩]

কবি নিজের হতাশা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায়। তিনি কষ্ট নিয়েই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান। তাই তিনি বলেন—

সুখের প্রত্যাশী নই, নিদ্রাহীন সারারাত, বিনিন্দ্র এসেছি
বিপুল বিভ্রান্তিভরা পৃথিবীতে, নিদ্রাহীন চলে যাবো জানি;
আকাশে ওড়ে না আর ভেঙে ভেঙে ঝ'রে পড়ে মস্তকে শরীরে।[৪]

কবির চিন্তায় ছিল স্বদেশ ও স্বসমাজ। দেশের প্রতি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। সবাই অধঃপাতে যাচ্ছে। হতাশগ্রস্থ কবি। কবির অনাগত সন্তান এই অন্ধকারে ক্লিষ্ট হিংস্র পৃথিবীতে কিভাবে বাস করবে এই চিন্তাই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে কবিকে। তিনি বলেন—

আমার সন্তান যাবে অধঃপাতে, চন্দারলোক নীল বন
তাকে কভু মোহিত করবে না। কেবল হোঁচট খাবে
রাস্তায়
সিঁড়িতে
ড্রয়িংরুমে
সমভূমি মনে হবে বন্ধুর পাহাড়
উল্টে পা হড়কে পড়ে যাবে
নিচে
আরো নিচে
ময়লায়
ড্রেনে [৫]

এই পৃথিবীতে–

সূর্য হবে একরাশ শক্ত অন্ধকার
সে অন্ধকার শুয়ে শুয়ে ছিঁড়বে নিজের মূল
হত্যাকারী ভাবনা তার ছুটবে চারদিকে
চড় হয়ে
বল্লম হয়ে
বন্দুক হয়ে
বোমা হয়ে ৬

বাংলাদেশের চিরায়িত নিয়ম বদলে যাচ্ছে। এদেশে একান্নবর্তী পরিবার ছিল। পরিবারের সবাই এক সঙ্গে খেতে বসত। মেহমান আসত। মেয়েরা নিজ হাতে পাক করে খাওয়াত। বাংলার সে বৈশিষ্ট্য আজ হারাতে বসেছে। তাই কবি বলেন—

এদেশ বদলে যাচ্ছে, যা-কিছু একান্ত এর
সব্ নির্বিচারে নির্বাসিত হচ্ছে প্রতিদিন

ফ্রিজ ধ'রে রাখছে ঠাণ্ডা দিঘি সজীব শস্যক্ষেত্রের স্মৃতি
হোটেলে সবাই খাচ্ছে গৃহ আর কাউকে আনে না
স্নেহময় শর্করার লোভে
বাঙলার মেয়েরা আজ রান্না জানে না
রক্তনালি অন্য রক্তময়। [৭]

হুমায়ুন আজাদ প্রেমের কবি। কবি দেখলেন প্রেমের চেয়ে নারীরা বিত্ত বৈভবকেই গুরুত্ব দেয় বেশি। বিত্তের আকর্ষণে তারা প্রেম প্রত্যাখ্যান করে সাদরে গ্রহণ করে বিত্ত বৈভব। তাই তিনি লেখেন–

থরোথরো পদ্য লিখে লাল নীল মেয়েদের
এই বুকে কতো যে ডেকেছি
আমার সোনালি বউ না হয়ে
তারা সব ধনীদের উপপত্নী হয়েছে [৮]

এই নারীরা জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ পায়নি, পেয়েছে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখা ফুলের মত জীবন। তাই কবি বলেন–

বালটিতে জল টেনে কতো দিন
গোলাপের শেকড়ে ঢেলেছি
আমার উঠোনে না ফুটে
উল্লাসভরে তারা ধনীদের ফুলদানিতে ফুটেছে। [৯]

কবির চোখে শহরের মানুষেরা সুখে নেই। যে সুখের জন্য মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে। সে স্বপ্নের ঢাকা শহর মানুষের কাছে বড় লোভনীয়। সুখ স্বপ্ন মানুষ শহর গড়েছে সেই শহরেই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ–

এ-শহরে প্রতিদিন ধূলিঝড় হয়
এ-শহরে প্রতিদিন ছাদের উপর থেকে
কেউ কেউ লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে
এ-শহরে প্রতি রাতে ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমোতে যায়। [১০]

কবি নিজের দেশকে দেখছে নিউজপ্রিন্টের মতো বিবর্ণ ধূসর। তিনি দেখেছেন-

এখানে প্রতিটি যুবক দেখে পচা স্বপ্নাবলি
এখানে প্রতিটি মিছিলে হাঁটে নষ্ট বাতিল অতীত
এখানে প্রতিটি শ্লোগানে বাজে নষ্ট পচা সুর
এখানে প্রতিটি মঞ্চ থেকে বিলি হয় পচা ইশতেহার। [১১]

হুমায়ুন আমাদের চেতনায় যেমন আছে সমকালীন সময়, দেশ, দেশের স্বাধীনতা, তেমনি তাঁর চেতনায় আছে প্রেমও। তিনি প্রেমে ব্যর্থতাকে বড় করে দেখেছেন। কেননা তার প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নষ্ট সময়, সবকিছুই যেন তার প্রেমে বাধ সাজে। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কবি। তাই তিনি লেখেন–

আমি বেরুলেই সূর্য নেভে
বৃষ্টি নামে কাঁটাতারের মতোন
নষ্ট হয় রাজপথ শহর বন্দর গ্রাম
সারা বাঙলা বন্যায় ভেসে যায়

আমি উঠলেই ট্যাক্সির টায়ার ফাটে
চৌরাস্তার নষ্ট লালবাতি।

..........................................

আমার অভিসার দিনে হঠাৎ ঘোষিত হয় পূর্ণ হরতাল।

..........................................

কস্তুরীর সঙ্গে যে-দিন কলাভবনের তেতলার
পশ্চিম কোণায় দেখা করতে যাবো
হঠাৎ মহরম উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।

..........................................

যে-দিন আমি প্রেমনিবেদন করবো ব'লে ভাবি
বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হার্টফেল ক'রে মারা যায়
আমাদের আর কোনো দিন দেখাই হয় না। [১২]

হুমায়ুন আজাদ কবিদেরই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতো তাঁর দেশকে, তাঁর প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশকে কবিরা ছাড়া আর কেউ ভালবাসতে জানে না। তাই কবি বলেন–

এ-সভা নিশ্চিত জানে বাঙলাদেশকে কবি ছাড়া ভালোভাবে আর কেউ জানে নাই। তাই
বাঙলার প্রতিটি পাতা সব পথ সব নদী হৃৎপিণ্ড কবিরাই ভালো পড়েছেন।
এসভা প্রস্তাব করছে বাঙলার রাষ্ট্রপতি অর্থমন্ত্রী চিরকাল হবেন কবিরা
এ-সভা প্রস্তাব করছে কবিতাই হবে বাঙলার কারেন্সি
এ-সভা প্রস্তাব করছে বাঙলার শাসনতন্ত্র রচনা করবেন কবিরা
কেননা কবিতাই বাঙলার একমাত্র অবিনশ্বর তন্ত্র
কবিতা ছাড়া বাঙলাদেশ আর কোনো তন্ত্রমন্ত্র জানে না
এ-সভা আনন্দিত মুজিবর ঘন ঘন রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন
এ-সভা প্রস্তাব করছে বিপন্ন রবীন্দ্রনাথকে যারা রক্তমাংসে রেখেছে বাঁচিয়ে
তিনি যেনো মাঝে মাঝে সেই সব তরুণ কবিদেরও উদ্ধৃত করেন। [১৩]
এ-সভা প্রস্তাব করেছে বাঙলার
গণপরিষদ যেনো কবিতা-
-পঠের...অবিনশ্বর বাহন

তাই কবিদের হুমায়ুন আজাদ সব সময় বড় করে দেখেছেন। 'যাও রিকশা, যাও' কবিতায় কবি লেখেন–

যাও রিকশা, যাও, হুমায়ুন আজাদের মন্দির
হুমায়ুন আজাদ, কবি, কবিদের ঠিকানা হৃদয়স্থ রাখতে হয়
সকলের, শুধু কবিদেরই স্থায়ী নিজস্ব ঠিকানা রয়েছে।
এ-মাটিতে এই জলে এ-আগুনে কবি ছাড়া সবাই উদ্বাস্তু ঠিকানাবিহীন,
কবি ছাড়া কে আর নিজের ঘরের মতো দেখে সব ঘর,
এমন সহজে কে আর পাতার সবুজ ছেঁকে গ'ড়ে তোলে মরমী মন্দির ![১৪]

হুমায়ুন আজাদের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল। ঐ বছরই বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ ছিন্ন করে পাকিস্তান স্বাধীন হয়। তিনি লিখেছেন—

আব্বা, লাল তাজা রক্তের মতোই কোলাহলময়। তাঁর প্রেমে ধান
জমি গৃহ স্ত্রী দেশ একাকার। আঠারো বছর বয়সে আব্বা যে
ত্রয়োদশী কিশোরীর প্রেমে পাগল হয়ে ইস্কুল ছাড়লেন,
সে-কিশোরী আমার জননী। আব্বা, আরো এক প্রেমে, কিশোরীর
প্রেমের মতোই তীব্র প্রেমে 'লড়কে লেংগে' বলে পাড়া গ্রাম থানা মাতাতেন।
জিন্নাকে দেখেননি কোনো দিন, জিন্নার জবান বোঝেন নি কখনো,
তবু বুঝেছিলেন দেশ চাই, কিশোরীর দেহের মতোন একান্ত স্বদেশ।
যে কিশোরী আমার জননী তার অভাবে আঠারো বছর বয়সে
আব্বা হাসিমুখে বিষ ঢেলে দিতে পারতেন গলায়
পারতেন প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা ভেঙে দিতে,
তেমনি পারতেন তাঁর সাধের দেশের জন্য বুকে নিতে ছুরির আঘাত। ১৫

হুমায়ুন আজাদ তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে পৌঢ় বয়সের নানান ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন-'হুমায়ুন আজাদ' কবিতায়। তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর জন্মের দিন তাঁর বাবা মাঠ থেকে বোরো ধান কেটে এনেছেন। এর কিছু দিন পরে এলো ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা। তাঁর আব্বা প্রেমে পড়ে স্কুল ছাড়লেন। বিয়ে করলেন ত্রয়োদশী এক কিশোরীকে। তারপর আজাদের বাল্যকালের অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী এই কবিতা। তিনি বাল্যকালের অনেক সাথীকে হারিয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার দ্বারা তার বাল্য সাথীদের অনেকেই নিগৃহীত হয়েছেন তিনি লিখেছেন—

মুসলিম লিগের রহমৎ খাঁ, যার মাথার জিন্না টুপি জিন্নার মতোই
শোভা পেতো, তার সাথে শেফালিতে সাতটি
রাত কাটাতে হয়েছে। ফয়জনরা এলো রাড়িখাল।
তারা আসাম না ত্রিপুরার কোথায় থাকতো।
আসার কয়েক মাস পর ফজু যার বিয়েই হয় নি
বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মারা গেলো।[১৬]

—পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের বাস্তব ছবি এটি। তিনি নির্যাতনের ছবি এঁকেছেন পরম নিষ্ঠার সাথে। তিনি দেখেছেন ভাষার জন্য কত লোক আন্দোলন করেছে। হাইস্কুল ছেড়ে যখন তিনি কলেজে আসেন তখন-তাঁর নিজের বর্ণনায়—

দুর্দান্ত বাঘের পিঠে চেপে আমি ইস্কুল ছেড়ে কলেজে এলাম
চারিদিকে মত্ত হাওয়া কালাকানুন রক্ত ১৪৪ ধারা
সামনে সুদীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ পারাবার
রক্তের লাল রঙ বুলেটের থেকে বেশি ধার [১৭]

দেশের এক ক্রান্তিকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন। তিনি লেখেন—

এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক বাগান
জ্ব'লে গেছে। ঢ'লে গেছে অনেক বাউল।
বাতিস্তম্ভ থেকে খ'সে গেছে আলো।

চারিদিকে অন্ধকার, সারাদেশ ঘুমহীন স্তব্ধ নিঃশ্চুপ,
রক্ত খাচ্ছে দশ দিকে এনএসএফ মোনেম আইউব।[১৮]

হুমায়ুন আজাদ ২৫ মার্চের ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ করলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর সহকর্মীদের, পরিচিত জনদের অনেককেই হানাদান বাহিনীর দোসরদের মাধ্যমে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ হত্যা করে। ভাগ্য গুণে বেঁচে যান হুমায়ুন আজাদ। তাই তিনি ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের হত্যার কথা স্মরণ করে লিখেছেন–

এলো ২৫ মার্চ ১৯৭১
যে-কোনো কারণে মারা যেতে পারতাম। আমি বাঙালি,
বাঙলা পড়াই, ভাত খাই, প্রেমে পড়ি, ব্যর্থ হই, রাত্রে ঘুমাতে
দেরি হয়, আমি মানুষ, এর যে-কোনো একটির জন্যে রাষ্ট্রদ্রোহী
বিবেচনায় আমাকে নিয়ে যেতে পারতো ওরা বধ্যভূমিতে।[১৯]

তিনি মনে করেন যেকোনো ভাবেই হানাদাররা তাঁকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস—

বেঁচেছিলাম একটি আলোর জন্যে যা এসে পৌঁছলো ষোলোই ডিসেম্বর।
'জয় বাঙলা', চিৎকার করে উঠি, 'এতো দিনে স্বাধীন হলাম।'[২০]

কবি পৃথিবীর কোনো কিছুতেই যেন আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। মানবিক সহ সংঘ, পরিষদ, সমাজ, সভ্যতা সমস্ত দলিল, যা কিছু ভালো, তা সবই যেন নষ্টদের অধিকারে চলে যাবে। পৃথিবীতে যেন এক ভয়বহ অন্ধকার নেমে আসবে। মানবতা সব কিছু ভূলুন্ঠিত হবে।
তাই কবি বলেন—

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।
নষ্টদের দানবমুঠোতে ধরা পড়বে মানবিক
সব সংঘ পরিষদ; চ'লে যাবে অত্যন্ত উল্লাসে
চ'লে যাবে এই সমাজ সভ্যতা-সমস্ত দলিল-
নষ্টদের অধিকারে ধুয়েমুছে, যে-রকম রাষ্ট্র
আর রাষ্ট্রযন্ত্র দিকে দিকে চ'লে গেছে নষ্টদের
অধিকারে। চ'লে যাবে শহর বন্দর গ্রাম ধানখেত
কালো মেঘ লাল শাড়ি শাদা চাঁদ পাখির পালক
মন্দির মসজিদ গির্জা সিনেগগ নির্জন প্যাগোডা।
অস্ত্র আর গণতন্ত্র চ'লে গেছে, জনতাও যাবে;
চাষার সমস্ত স্বপ্ন আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে একদিন
সাধের সমাজতন্ত্রও নষ্টদের অধিকারে যাবে।[২১]

প্রেম মানুষকে করে মহীয়ান। কবির বিশ্বাস প্রেম ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। সবার দরকার প্রেম। প্রেম পেলে মানুষ নিষ্ঠুর হয় না। যাদের প্রেমের সাক্ষাৎ মেলেনি কখনো তারাই নিষ্ঠুর হয়। কৃষক, আমলা, আইন শৃঙ্কলা রক্ষীবাহিনী, মন্ত্রী কেহই প্রেমের পরশ না পেলে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। মনুষ্যত্বের মূলেই প্রেম-তাই কবি বলেন--

আমি কিছুতেই, বুঝতে পারি না কীভাবে তোমাকে ছাড়া
–উদ্দেশ্যবিহীন-বেঁচে আছে এ-দুর্দশাগ্রস্থ গ্রহের
দেড় হাজার মিলিয়ন মানুষ। অনাহার, রোগ, শোক,

খরা, ঝড়, ভূমিকম্প আর ব্যাপক মানবাধিকারহীনতায়
তারা যতো কষ্ট পায় তারও বেশি কষ্ট পায়
তোমার অভাবে। তুমি যার পাশে নেই, মেয়ে, সে-ই ভোগে
রক্তচাপে হৃদরোগে। দেশে ও বিদেশে যে শ্রমিকেরা
এতো ক্লান্ত তার মূলে তোমার অভাব, আর শতাব্দী পরম্পরায়
কৃষকেরা যে দুরারোগ্য হতাশায় ভোগে তারও কারণ
তুমি পাশে নেই কৃষকের। আমলার অনিদ্রার মূলে তুমি,
আইনশৃঙ্খলারক্ষীবাহিনী যে সামান্য উসকানিতে এতো হিংস্র
হ'য়ে ওঠে তারও কারণ তুমি।[২২]

বাংলা ভাষার প্রতি কবির শ্রদ্ধা অপরিসীম। যা কিছু আমাদের দীর্ঘশ্বাস,উল্লাস, প্রেম, অশ্রু, বিদ্রোহ সবইতো ঐ বাংলা ভাষায়। তাই কবি 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' কাব্যের 'বাঙলা ভাষা' কবিতায় বাংলা ভাষাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চণ্ডীদাস
শতাব্দী কাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন
তোমার থরোথরো প্রেমের নাম রবীন্দ্রনাথ
বিজন অশ্রু বিন্দুর নাম জীবনানন্দ
তোমার বিদ্রোহের নাম নজরুল ইসলাম[২৩]

উনিশ শত বাহাত্তরে দেশ স্বাধীন হলো। এর রাশ আশা নিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আনন্দে যেতে উঠেছিল বাঙালি। কত আশা, কত স্বপ্ন জেগেছিল বাঙালিদের মনে প্রাণে। কিন্তু এক বছর সময় পেরোতে না পোরোতেই আশা হতাশায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার তিন বছরেই বাংলাদেশ অনাহার, হাহাকার, অসুস্থতা, পরাবাস্তব খুন খারাপিতে ভরে ওঠে। কিন্তু কত আশাই না ছিল কবির মনে—

সব ভুল সংশোধিত হবে, সংশোধিত হবে, সংশোধিত হবে
ব'লে আমিও অন্তর্লোকে জপেছিলাম অত্যন্ত অসম্ভব মন্ত্র।
কিন্তু আশা-অন্ধ আর নির্বোধের দুঃস্বপ্ন-টেকে নি; আরেক ডিসেম্বর
আসতে-না-আসতেই আমার স্বাধীনতালব্ধ প্রতীকী চিত্রকল্প
নষ্ট হয়ে যায়।[২৪]

..............................................................................

তাই কবি বলেন—

বাংলাদেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব-স্বপ্ন ও আশার যুগের পর গভীর ব্যাপক
এক অপ্রকৃতিস্থতার যুগ শুরু হ'য়ে গেছে।[২৫]

কবি স্বাধীনতার পর 'সদ্য গ্রাম থেকে আসা এক সবুজ তরুণ নাসিরুল ইসলাম বাচ্চুকে দেখেছিলেন। তাকে দেখে কবির কাছে স্বাধীনতালব্ধ চিত্রকল্প আরো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। পরে দেখে এই সমাজ ও সভ্যতায় নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে। এখন সে—

বিড়বিড়
করতে করতে হাঁটে আর ভাঙা দেয়ালের ওপরে ব'সে 'প্রেম, প্রেম,
বিপ্লব, বিপ্লব' ব'লে চিৎকার ক'রে থুতু ছুঁড়ে দেয় শহর-স্বদেশ—

সভ্যতা-স্বাধীনতা প্রভৃতি বস্তুর মুখে। কয়েক বছরে
যৌবন জীর্ণ হ'য়ে নাসিরুল ইসলাম বুড়ো হ'য়ে যায়,
..........................................তার চোয়াল দিকে দিকে
ভেঙে পড়ে, মাথায় জন্ম নেয় বাঙলাদেশের মতো এক ভয়ংকর জট,
আর সে বাঁ-হাতে আস্তিনের তলে বইতে থাকে একখণ্ড ইট।
পাঁচ বছরে আমার বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প-রাইফেলের নলের শীর্ষে
রক্তিম গোলাপ–রূপান্তরিত হয় একমাথা ভয়ংকর জট আর
আস্তিনের তলে একখণ্ড ইটে। স্বাভাবিক বাস্তবতা পেরিয়ে যারা
অস্বাভাবিক বাস্তবতায় ঢুকে পড়ে, তারা নতুন বাস্তবতায় ঢোকার
আশ্চর্য মাসগুলোতে সবখানে দেখতে পায় নিজের প্রভাব।[২৬]

পরে নাসিরুলের মত অস্বাভাবিক বাস্তবতায় এক এক করে সবই প্রভাবিত হয়। কবিও এক সময় অস্বাভাবিক বাস্তবতায় নিজে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন–

এখন যখনি রাস্তায় হাঁটি, খবরের কাগজ উল্টেই, টেলিভিশনের
চব্বিশ ইঞ্চি বাক্সটা খুলি, ক্লাবে বা বাজারে যাই,
সচিবালয়ে ঢুকি, আলোচনা কক্ষে বা সভায় গিয়ে বসি, দেখতে পাই
আমাকে ঘিরে ফেলছে অসংখ্য নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু–
মাথায় বাঙলাদেশের মতো জট, ছেঁড়া শার্ট, বাঁ-হাতে হলদে ইটের খণ্ড।
সেদিন সন্ধ্যায় তিনটা আধাশিক্ষিত কবি, দুটি দ্বান্দ্বিক
প্রবন্ধকার, একটা দালাল, তিনটি লুম্পেন, দুটি এনজিও, পাঁচটি আমলার
সাথে সমাজ ও শিল্পের সম্পর্ক, শিল্প আর জীবনের বৈপরীত্য,
অর্থের মূলতত্ত্ব, তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির নোংরা ব্যাকরণ,
গনতন্ত্র, জলপাইরঙের উত্থান ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র বাক্য ছুঁড়ে
যখন রাস্তায় একা হেঁটে ফিরছিলাম, তখন চমকে উঠে টের পাই :
আমার মাথায় শক্ত হ'য়ে উঠছে জট, শার্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে, গাল ভাঙা,
বাঁ-হাতে অত্যন্ত যত্নে আমি ধ'রে আছি একখণ্ড হলদে প্রিয় ইট। [২৭]

কবি প্রথম জীবনে অট্টালিকা, নারী, সংঘ, পরিষদ, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সভ্যতা প্রভৃতি থেকে বাইরে ছিলেন। এসব জায়গায় ঢোকার চেষ্ঠা করেও কোথাও ঢুকতে পারেননি তিনি। তাই কবির কথায়—

এক সময়ে বাইরে ছিলাম,—যা কিছুর অভ্যন্তর,
দরোজা জানালা আছে, যথা—অট্টালিকা, নারী, সংঘ,
পরিষদ, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সভ্যতা প্রভৃতি—
প্রবেশাধিকার ছিলো না সে-সবে। দাঁড়িয়ে থেকেছি
বাইরে-শিলাবৃষ্টিতে, ঘূর্ণিঝড়ে, বোশেখি আঁধিতে,
আভালাঁসে, দাবানলের চেয়েও ক্রুদ্ধ হিংস্র রৌদ্রে,
ক্ষুধার্ত রাস্তায়।[২৮]

কবি যখনই ঢুকতে চাইতেন সমাজ-নোংরা-ডাস্টবিনে তখনই তা বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু একদিন তিনি ঠিকই সভ্যতার নোংরা

অন্ধকারে ঢুকতে পেরেছিলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তা উপভোগ করলেন কিন্তু সভ্যতার নোংরা কদর্য দিকগুলো উপভোগ করতে যেয়ে বুঝতে পারলেন জীবন এখানে নেই। কবির ভাষায়—

আমি, প্রবেশাধিকারহীন ওই দরোজা জানালা
অভ্যন্তর মণ্ডিত সামগ্রীতে, বাইরে থেকেছি
যুগযুগ।..........................................

একদিন সবকিছু খুলেছে দরোজা-বন্ধ নারী,
অট্টালিকা, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সংঘ, পরিষদ,
সভ্যতা-যা কিছু দরোজাসম্পন্ন, অভ্যন্তরণ্ডিত।
আমি আরো অভ্যন্তরে যাবো ব'লে পা বাড়াই, দেখি
আর অভ্যন্তরে নেই, আছে শুধু গাঢ় অন্ধকার।
.............................. একদা আমার ক্ষিপ্ত বীর্য
বন্ধ্যা পাথরকেও করেছে পুষ্পবতী; সেই আমি,
এখন সংরাগহীন, নপুংসক, নিরুত্তাপ, জীর্ণ,
প্রতিভাবঞ্চিত, ম্লান; না, আমি বেরিয়ে পড়বো;
এই পর্দা, দেয়াল, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা লণ্ডভণ্ড ক'রে
আবার বর্বর ঝড় রৌদ্র ক্ষুধাভরা বাইরে বেরোবো।[২৯]

কবির অনেক উচ্চশা ছিল। মনে করতেন তিনি অনেক বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরি হবেন। তাই রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্রনাথ কবির আদর্শ। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকাকে বহন করতে পারছেন না। তিনি নিজেকে অনেক হেয় মনে করেন। তাঁর কথায়—

নিজেকে ঈগল, রহস্যের যুবরাজ, নীলিমায় ডানা-ঝাপটানো
দেবদূত ভাবা দূরে থাক, অধিকাংশ সময় নিজেকে মানুষও
ভাবতে পারি না। বোধ করি আমি কুকুর-শুয়োর-তেলেপোকা
প্রভৃতি ইতর পশু আর পতঙ্গের বংশোদ্ভূত;

..........................................................

অর্থাৎ আমি নই তোমার উত্তরাধিকারী, রবীন্দ্রনাথ; পতঙ্গ—
পশুর বংশোদ্ভূত আমি—আবর্জনাবাসী, যেখানে কখনো কোনো
রৌদ্র আর জ্যোৎস্না জ্বলে না।[৩০]

আমাদের গৌরব, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সবকিছুই ঐ স্বাধীনতা। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার দশ বছর পরে যেন আমরা সব পঙ্গু হয়ে গেছি। সেই শৌর্য, বীর্য যেন আজ আমাদের আর নেই। কবি 'পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে' কবিতায় বলেন—

এক দশকেই যুদ্ধাহত তোমরা সব পঙ্গু হ'য়ে গেছো।
এখন বাঙলাদেশে সব বাঙালিই পঙ্গু।

যে বাঙালিকে কুশল জিজ্ঞেস করি
সে-ই জানায় সে আপাদমস্তক পঙ্গু হ'য়ে গেছে।[৩১]

'নদীর ঘোলাটে জল', 'পাখির ঝাঁক', 'বিমর্ষ জোনাকী', 'ধানের হলদে শিষ', 'আত্মীয়', স্ত্রী, কন্যা, ভ্রূণের সন্তান, ছাত্র প্রেমিক, চাষী, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কাজের মেয়ে, প্রিয়তমা সবকিছুকে প্রশ্ন করলে কবি জবাব পান তারা পঙ্গু হয়ে গেছে।

এখন বাঙলাদেশে সব বাঙালিই আপাদমস্তক পঙ্গু।
ক্রাচে-ভর-দেয়া স্টেনগান
এখন বাঙলাদেশ তোমাদের মতোই পঙ্গু

.................................................

এক দশকেই মুক্তিযোদ্ধা
বাঙালি
আর বাঙলাদেশ
মাথা থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে পা পর্যন্ত পঙ্গু হ'য়ে গেছে। [৩২]

কবি বর্তমান সভ্যতাকে আততায়ীর সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ সভ্যতা আজ অমানবিক যুগে উপনীত হয়েছে। এ সভ্যতা আজ খুনি সভ্যতা, এই সভ্যতায়—

আমার শ্যমল কন্যা জন্ম নিয়ে দোলনায় উঠতেই দ্যাখে
তাকে ঘিরে ফেলেছে লাখ লাখ সশস্ত্রবাহিনী।
আমার শ্যামল পুত্র জন্ম নিয়ে দোলনায় উঠতেই দ্যাখে
তার দিকে উদ্যত হ'য়ে আছে দশ কোটি জঘন্য রাইফেল।[৩৩]

তাই কবির বিশ্বাস—

পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত
হোয়াইট হাউজ, ক্রেমলিন, দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট, আর বঙ্গভবন
দখল ক'রে আছে মাফিয়ার সদস্যরাই—
পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধান মাফিয়ার সক্রিয় সদস্য।[৩৪]

কিন্তু কবি লক্ষ করলেন–মানুষের মধ্যে মনুষত্ব বিলুপ্ত হচ্ছে। কেন মানুষের এত অধঃপতন। পশুর গর্ভে জন্ম নেয় পশু, কিন্তু মানুষের গর্ভে কেন মানুষ জন্ম হয় না। এই প্রশ্নই কবির কাছে আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।–

মানুষের দুর্ভাগ্য মানুষ একটি মিশ্র প্রজাতি।
চিরকাল গাধার গর্ভে আর ঔরসে জন্ম নেয় গাধা,
গরুর গর্ভে ও ঔরসে জন্ম নেয় সরল শান্ত গরু,
বাঘের ঔরসে আর গর্ভে কখনো কালকেউটে জন্মে না,
যেমন কালকেউটে কোনো দিন কালকেউটে ছাড়া
প্রসব করে না হরিণ বা রাজহাঁস বা স্বপ্নের মতো কবুতর।
কিন্তু মানুষের ঔরসে আর গর্ভে আমি জন্ম নিতে
দেখেছি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাধা।[৩৫]

কবি হতাশাগ্রস্ত হলেও মানব সভ্যতার প্রতি তিনি কোনো আস্থা হারান নি। কিন্তু কবির প্রত্যাশা পৃথিবীতে এমন এক দিন আসবে যে দিন আর কোনো নেকড়ে, বন্ধুক, শিরস্ত্রান, বুট, জলপাই রঙের পোশাক থাকবে না। থাকবে শুধু থোকায় থোকায় জলপাই, আকাশ ভরা তারা। অনাগত বংশধরদের আর কোনো দুশ্চিন্তা বা কোনো ভয় থাকবে না।

এখন নতুন সভ্যতাকে উঠে যেতে হবে পৃথিবীকে
যাতে জন্মেই শিশু শিউরে না ওঠে
তিন বাহিনীর সম্মিলিত কুচকাওয়াজ দেখে,
ট্যাংকের অন্ধ ঘড়ঘড় আর বিমানের কোলাহল শুনে।
জন্ম নেয়ার পর তার দিকে দুলে উঠবে ধান আর গমের গুচ্ছ
তাকে কোলে নেয়ার জন্যে দু-বাহু বাড়াবে আফ্রিকা
দোলনা দুলে উঠবে ইউরোপে
এশিয়ার সমস্ত আকাশে উড়বে লাল নীল রঙিন বেলুন
ঘুমপাড়ানিয়া গান ভেসে আসবে দুই আমেরিকা থেকে
মনুষ্যমণ্ডল থেকে তার জীবনের মাঠে মাঠে অঝোর ধারায়
ঝরবে মানবিকতার উর্বর মেঘদর।
না, পৃথিবীতে আর একটিও বন্ধুক থাকবে না।[৩৬]

হুমায়ুন আজাদ প্রতিবাদী কবি কন্ঠ। তিনি তাঁর চারপাশের প্রতিবেশকে দেখেছেন খুব নিকট থেকে। প্রত্যাহিক জীবনের নানা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজের নানা অন্যায়, অসংগতি, অত্যাচার, ঘুষ, দুর্নীতি, নীতিহীনতা প্রভৃতি তিনি দেখে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দেখেছেন কীভাবে মানুষ মানুষের শত্রু হয়, শয়তানের চেয়েও চক্রান্ত কুশল হয়, গণতন্ত্রের শত্রু হয়, প্রগতি-সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে থাকে চিরকাল। যারা প্রকাশ্যে জনতার স্তব গায়, গোপনে তাদের পিঠে অতর্কিত ছোরা ঢুকায়, প্রগতির পতনে উল্লাস করে, একনায়ক বা স্বৈরাচারী শাসকের মোসাহেব হয়, কীভাবে একনায়কের পা চেটে উপরে ওঠে সুযোগ সন্ধানী মানুষ। স্বৈরতন্ত্রকে যারা সমর্থন করে, অস্ত্রই যাদের ঈশ্বর, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে যারা বেঁচে থাকে, ধর্মান্ধ হয়ে যারা পারলৌকিক ব্যবসা ফেঁদে দুনিয়ায় রঙিন বেহেশতো তুলে, শোষণ করে যারা অঢেল সম্পদের মালিক হয়, রাজনীতিবিদ হয়ে যারা জনতার সম্পদ আত্মসাত করে, যার জাতির দুর্যোগে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয় আর দুর্দিনে পায়রার মত পাকা ধান খেতে আসে, যারা অন্য দলের মধ্যে কোন্দল বাধিয়ে দল ভাঙায়, বিদেশি এজেন্ট হয়ে যারা দেশ বিক্রি করে, আমলা হয়ে যারা গুলশান বনানীতে বাড়ি কেনে অবৈধ টাকায়, যারা কোনো পাকা প্রতিক্রিয়াশীলদের রূপসী কন্যাকে স্ত্রী করে রাখে, আবার বন্ধুর স্ত্রীদের সাথে বাইরে ফষ্টিনষ্টি করে, যে সব আমলারা স্ত্রীর বয়স চল্লিশের পরে অধস্তন কোনো আমলার-যুবতী বউকে ভাগিয়ে ঘরে আনে, হুমায়ুন আজাদ তাদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' কাব্যের 'যতোবার জন্ম নিই' কবিতায়। তাই কবির ভাষায়—

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক—
ঠিক করি হবো রাজনীতিবিদ: জনতার নামে জমাবো সম্পদ।
জাতির দুর্যোগে পালাবো নিরাপদ স্থানে, সুসময়ে ফিরে এসে
পায়রার মতো খুঁটে খাবো পাকা ধান। কোন্দলে ভাঙবো দল, হবো
বিদেশি এজেন্ট—সারা দেশ বেচে দেবো শস্তায় বিদেশি বাজারে।[৩৭]

কবি হুমায়ুন আজাদ সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্যকেই তিনি ভালোবেসেছেন, মুদ্রাকে ঘৃণা করেছেন আজীবন। 'আর্ট গ্যালারি থেকে প্রস্থান' কবিতায় তিনি লেখেন—

দুই যুগ আগে সবে শুরু হয়েছে তখন আমার যৌবন।
কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি যেমন বাঁশির অভ্যন্তরে আলোড়িত
হয় সুরে সুরে, সুন্দরে সৌন্দর্যে। স্বপ্নে জাগরণে শুধু চাই

সুন্দর ও সৌন্দর্যকে; আর কিছুকেই চাওয়ার যথেষ্ট যোগ্য
ব'লে ভাবতেও পারি না। ঘৃণা করি সব কিছু, তীব্র ঘৃণা করি
মুদ্রাকে, তোমরা যেমন ঘৃণা কর আবর্জনাকে। ধ্যান করি
শুধু সুন্দরের, সৌন্দর্যের।[৩৮]

কিন্তু কবির চারদিকে শুধু নির্মম বাস্তবতা, আর সেই অশ্লীল নোংরা কদর্যতা, কবি প্রাণপণে এই নোংড়া কুৎসিৎ তুচ্ছ জীবনকে ঘৃণা করেন। তাই কবি বলেছেন—

আমি চেয়েছি সুন্দর, আর সৌন্দর্যকে, আর শিল্পকলাকে,
জীবনের চেয়েও যা শাশ্বত ও মূল্যবান। আমার দায়িতা
ছিলো বিমানবিক সুন্দর, যা নেই নারীতে, রৌদ্রে, মেঘে, জলে,
পাখিতে, পশুতে, পুষ্পে। আছে শুধু শিল্পে, শাশ্বত শিল্পকলায়।[৩৯]

তাই কবি বলেন—

যা কিছু পচনশীল, যা কিছু মাংসে গঠিত আমার তা নয়;
আমি তার নই। পার্থিব পুষ্প দেখেছি; জলাশয়ে প্রাণবন্ত
মাছ, আর বনভূমে পশুপাখি অনেক দেখেছি। পৃথিবী যে
রমণীয়, তার মৌল কারণ যে-রমণীরা, তাদেরও দেখেছি।
কিন্তু সবই প'চে যায়, মানবিক সব কিছু প'চে নষ্ট হ'য়ে
যায়। শুধু থাকে শিল্পকলা, যা কিছু পবিত্র শুদ্ধ অনশ্বর,
যার জন্যে জীবন আমি ভৃত্যদের বকশিশ দিয়ে দিতে পারি।[৪০]

হুমায়ুন আজাদ প্রতিভাধর কবি। তিনি তাঁর সময়ের মানুষদের প্রতি কোথাও কোনো আস্থা রাখেতে পারছিলেন না। তাঁর চারপাশে তিনি যাদেরকে দেখেছেন তারা তো মানুষ নামের অযোগ্য। এ জন্য সময়কেই দায়ী করেছেন তিনি। 'গরু ও গাধা' কবিতায় তাই তিনি বলেন—

আজকাল আমি কোনো প্রতিভাকে ঈর্ষা করি না।
মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ এমন কি সাম্প্রতিক ছোটোখাটো
শামসুর রাহমানকেও ঈর্ষাযোগ্য ব'লে গণ্য
করি না; বরং করুণাই করি। বড় বেশি ঈর্ষা
করি গরু ও গাধাকে;–মানুষের কোনো পর্বে গরু
ও গাধার এতো বেশি প্রতিষ্ঠিত, আর এতো বেশি
সম্মানিত হয় নি কখনো।[৪১]

যোগ্যতম কোনো প্রতিভা জন্ম তো হচ্ছে না, বরং অযোগ্য, অদক্ষ, লোকে ভরে গেছে কবির কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেন—

অমর ও জীবিত
গরু ও গাধায় ভ'রে উঠছে বঙ্গদেশ; যশ খ্যাতি
পদ প্রতিপত্তি তাদেরই পদতলে। সিংহ নেই,
হরিণেরা মৃত; এ-সুযোগে বঙ্গদেশ ভ'রে গেছে
শক্তিমান গরু ও গাধায়। এখন রবীন্দ্রনাথ

বিদ্যাসাগর বাঙলায় জন্ম নিলে হয়ে উঠতেন
প্রতিপত্তিশালী গরু আর অতি খ্যাতিমান গাধা।[৪২]

হুমায়ুন আজাদ সমসাময়িক কালের বাস্তব সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জ্ঞান, শিক্ষা, প্রতিভার কোনো মূল্য নেই এ সমাজে। তাই তিনি দেখলেন যারা সমাজের ক্ষতিকারক, সন্ত্রাসী, তাদেরই কদর সর্বত্র। যাদের দ্বারা ধ্বংস করা যায়, ক্ষতি করা যায়, হত্যা করা যায় তাদেরই সমাদর এ সমাজে। তাই তিনি 'যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল' (১৯৮৭) কাব্যের 'বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ ১৯৮৬' কবিতায় লেখেন—

যদি আপনার ভেতরে কোনো কবিতা না থাকে, শুধু হাতুড়ি থাকে
যদি আপনার ভেতরে কোনো কবিতা না থাকে, শুধু কুঠার থাকে
যদি আপনার ভেতরে কোনো কবিতা না থাকে, শুধু রিভলবার থাকে
যদি আপনার ভেতরে কোনো স্বপ্ন না থাকে, শুধু নরক থাকে
তাহলে আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি[৪৩]

কবির মতে– যে অবলীলায় শিশু পার্কে এক ঝাঁক কবুতরের মতো ক্রীড়ারত শিশুদের ছুঁড়ে দিতে পারে হাতবোমা, যদি কল্লোলমুখর একটা কিণ্ডারগার্টেনে পেট্রল ঢেলে আগুন দিতে পারে, যে অবলীলায় প্রেমিকাকে খুন করতে পারে, যে সহপাঠীর বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিতে পারে, যে জেব্রাক্রসিংয়ে পারাপাররত পথচারীদের ওপর দিয়ে উল্লাসে গাড়ি চালাতে পারে সে-ই প্রতিভাবন পুরুষ। যে পুরুষ, পিতার শয্যার নিচে টাইমবোম ফিট করে যাত্রা করতে পারে পানশালার দিকে, জননীকে হত্যার জন্য ফেলে দিতে পারে টাওয়ারের আঠারো তলার ব্যালকনি থেকে, এসিড ছুঁড়ে রূপসী মেয়েটির মুখ কুৎসিত করে দিতে পারে, তাকেই কবি মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ দিয়ে সমাজের ভার দিতে চান। তাই কবি বলেন—

আপনার ওপর ভার দেয়া হবে রাষ্ট্রের
আপনার ওপর ভার দেয়া হবে সভ্যতার
আপনার খাদ্য হিশেবে বরাদ্দ করা হবে গুদামের পর গুদাম ভর্তি বারুদ
আপনার চিত্তবিনোদনের জন্যে সরবরাহ করা হবে লাখ লাখ স্টেনগান

আপনি যদি হন আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিভাবান পুরুষ
তাহলে 'পোস্টবক্স: বাঙলাদেশ ১৯৮৬'তে
আজই আবেদন করুন[৪৪]

কবি 'নষ্ট হৃৎপিণ্ডের মতো বাংলাদেশ' কবিতায় উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের সমস্ত মানুষদের মধ্যে দেশকে শুধু কৃষকেরা ও কবিরাই বেশি ভালোবাসে। কৃষকেরা, সবুজ ফসলের মাধ্যমে বাংলার প্রকৃতিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, আর কবিরা স্তব রচে বাংলাদেশের রূপের। তাই বলেন—

তোমার দুই চির-অপ্রতিষ্ঠিত পুত্র কবি ও কৃষক ( নিষাদেরাই
প্রতিষ্ঠিত চিরকাল ) তোমার রূপের কথা
রটায় দিনরাত। একজন ধানখেতে তোমার দেহের
স্তব ক'রে যেই গান গেয়ে ওঠে অন্যজন অমনি পুথির ধূসর
পাতা ভ'রে তোলে সমিল পয়ারে।
একজনকে তুমি এক বিঘে ধান দিলে সে তোমার দশ বিঘে
ভ'রে তোলে গানে। অন্যজনকে যখন তুমি

একটি পংক্তি দাও সে তখন দশশ্লোক স্তর রচে তোমার রূপের।
এ ছাড়া তোমার স্তব কোনো কালে বেশি কেউ
করে নি কখনো, বরং কুৎসাই রটিয়েছে শতকে শতকে।[৪৫]

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্তন হচ্ছে দিন দিন ভালো থেকে খারাপের দিকে। এক সময় আদর্শ, কিংবদন্তি, বিপ্লব, বিশ্বাস ও শব্দ যে অর্থ বহন করত, এখন সে অর্থ বহন করে না। তা পরিবর্তিত হচ্ছে কখনো ধীরে ধীরে, কখনো দ্রুত। 'আমার চোখের সামনে' কবিতায় কবি বলেন—

আমার চোখের সামনে প'চে গ'লে নষ্ট হলো কতো শব্দ,
কিংবদন্তি, আদর্শ, বিশ্বাস। কতো রঙিন গোলাপ
কখনো বা ধীরে ধীরে, কখনো অত্যন্ত দ্রুত, পরিণত হলো
নোংরা আবর্জনায়।[৪৬]

কবি দেখলেন—

আমার বল্যে 'বিপ্লব' শব্দটি প্রগতির উত্থান বোঝাতো।
যৌবনে পা দিতে-না-দিতেই দেখলাম শব্দটি প'চে যাচ্ছে-
ষড়যন্ত্র, বুটের আওয়াজ, পেছনের দরোজা দিয়ে
প্রতিক্রিয়ার প্রবেশ বোঝাচ্ছে। [৪৭]

আর—

'সংঘ' শব্দটি গত এক দশকেই কেমন অশ্লীল হয়ে উঠেছে।
এখন সংঘবদ্ধ দেখি নষ্টদের, ঘাতক ডাকাত ভণ্ড আর
প্রতারকেরাই উদ্দীপনাভরে নিচ্ছে সংঘের শরণ। যারা
মানবিক, তারা কেমন নিঃসঙ্গ আর নিঃসংঘ ও
অসহায় হয়ে উঠছে দিনদিন।[৪৮]

এভাবে কবি দেখলেন তার চোখের সামনে সবচেয়ে রূপসী মেয়েটি প্রথমে অভিনেত্রী, পরে নায়িকা, অবশেষে বিখ্যাত পতিতা হয়ে উঠলো। এক দশকের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার হয়ে উঠলো আর 'রক্তের দাগ লাগা সবুজের রঙের বাংলাদেশ দিন দিন হয়ে উঠছে বাংলাস্তান।

হুমায়ুন আজাদের 'পুত্র কন্যাদের প্রতি মনে মনে' একটি অসাধারণ কবিতা। এ কবিতায় তিনি তাঁর পুত্র কন্যাদের পরামর্শ দিয়ে এবং তাদের সাবধান করে দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের প্রতিটি পুত্র-কন্যাকেই যেন বললেন—

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যা, শিশু পুত্র আমি বারেবারে
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এক কূট অন্ধকারে
আসলে পৌঁচেছো। এ-সূর্য, বিদ্যুৎ, নিওন টিউব
বড়ো বেশি প্রবঞ্চক : পৃথিবীতে অন্ধকার খুব।
পথ দেখানোর ছলে এরা কোনো ভয়াবহ খাদে
পৌঁছে দেবে তোমাদের; বিপজ্জনক সব ফাঁদে
আটকে যাবে। চারদিকে ধ্বনিত হবে আর্ত চিৎকার
নিজেদের ঘিরে দেখে থাবা-মেলা ক্রূর অন্ধকার।[৪৯]

তিনি আরো সাবধান করে দিয়ে বলেন—

তথাকথিত এ-আলো ঠাণ্ডা, দুষ্ট, কদর্য, কুটিল,
চক্রান্তপরায়ণ, অন্ধকারের চেয়েও অশ্লীল।
আর ওই সমাজরাক্ষস, তোমরা যে-দিকেই যাবে
সে-দিকেই মেলে দেবে হিংস্র হাত-ধ'রে গিলে খাবে
সুযোগ পেলেই। তাই সাবধান, একটু ফসকালে
পৌঁছে যাবে উদ্ধাররহিত কোনো নিস্তল পাতালে।[৫০]

কবি সমসাময়িক সভ্যতায় বিশ্রদ্ধ হয়ে দেখলেন সত্য এখন আর সুন্দর নয়, অসত্যই যেন এ সমাজে এখন সুন্দর। তাই কবির ভাষায়—

ঘৃণা করো সততাকে সামাজিক পিতাদের মতো
প্রত্যেক মুহূর্তে, অসত্যকে জপ কোরো অবিরত।
সুনীতি বর্জন কোরো, মহত্ত্বের মুখে ছুঁড়ো থুতু,
মনুষ্যত্বকে মাড়াতে দ্বিধাহীন হয় যেনো জুতো
তোমার পায়ের। দুর্বলকে নিশ্চিন্তে পদাঘাত কোরো
পায়ের আভাস পেলে সবলের নত হয়ে পোড়ো
তার দিকে, চিরকাল সবলের থেকো পদানত,
তার পদযুগলের চকচকে পাদুকার মতো।
শত্রু হয়ো মানুষের, দানবের পক্ষে চিরদিন
দিয়ো জয়ধ্বনি; প্রতিক্রিয়াশীলতার নিশান উড্ডীন
রেখো গৃহে ও গাড়িতে; নিয়ো তুমি প্রত্যহ উদ্যোগ
যাতে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে মধ্যযুগ।
যা কিছুই মানবিক তার শিরে, হে আমার পুত্র,
সকালে, দুপুরে রাত্রে ঢেলো তুমি মল আর মূত্র। [৫১]

—এসব পাঠ কলে বুঝা যায় সমকালীন সমাজের প্রতি কবি কতই না ক্ষিপ্ত ছিলেন।
পুত্রকে উদ্দেশ্য করে কবি আরো বলেন—

পুত্র তুমি জপ কোরো দিনরাত—টাকা, টাকা, টাকা,
টাকা, টাকা। একমাত্র এই বস্তু ইন্দ্রজাল মাখা
পৃথিবীতে; সব কিছু নষ্ট হয়, সবই নশ্বর;
টিকে থাকে শুধু টাকা—শক্তিমান, মেধাবী, অমর।
জেনো পুত্র মহত্ত্বে গৌরব নেই, কালোবাজারিতে
নিহিত গৌরব; অমর্ত্য গীতাঞ্জলির থেকে পৃথিবীতে
জুতো ও অনেক দামি, অমরত্বের চেয়ে শোনো প্রিয়,
বহুগুণে মনোরম শীততাপনিয়ন্ত্রিত গৃহ।
ভুল পথে, আমার মতোন, যেয়ো নাকো ; অবিকল
হয়ো তুমি সামাজিক পিতাদের মতোই গাড়ল।[৫২]

কবি তাঁর কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

তুমি তো জানো না কন্যা, শ্যামলাঙ্গী, অমৃত হৃদয়া;
চলছে আজ উজ্জ্বল পতিতাবৃত্তি, এবং মৃগয়া
এ-গ্রহে, পৃথিবীতে পতিতারাই প্রসিদ্ধ এখন।
জেনো প্রতিভা-সৌন্দর্য নয় শুধু যৌন আবেদন
তোমার সম্পদ। শিখে নিয়ো তুমি তার নিপুণ প্রয়োগ,
চিত্ত নয়, দেহ দিয়ে পৃথিবীকে কোরো উপভোগ।
তোমাকে সম্ভোগ করতে দিয়ো না কাউকে; প্রীতি-স্নেহ
থেকে দূরে থেকো; যাকে ইচ্ছে হয় তাকে দিয়ো দেহ,
কিন্তু কক্ষণো কাউকে হৃদয় দিয়ো না। তুমি তবে
পরিণত হবে লাশে; আমন্ত্রিত হবে না উৎসবে।[৫৩]

বাংলাদেশে ফুল ফোটে, ফলে ধান, শিম, খিরোই, তরমুজ, সুস্বাদু কুমড়া, ফলে ফজলি আম, কামরাঙা, পেয়ারা, জাম, প্রবাহিত হয় নদী, পাওয়া যায় ইলিশ, বোয়াল, বাংলার আকাশে চাঁদ ওঠে, পাখি ডাকে, আরও কত কি ? এই সৌন্দর্যমণ্ডিত, ফুলে ফলে ভরা বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেছেন কবি। এই বাঙলার প্রতিই কবির প্রশ্ন—

যে তুমি বইয়ে দাও মধুদুগ্ধ গাভীর ওলানে
খড় আর ঘাস থেকে, যে তুমি ফোটাও মাধবী
আর অজস্র পুত্রকে দাও ছন্দ—ক'রে তোলো কবি,
যে তুমি ফোটাও ফুল বনে বনে গন্ধভরপুর—
সে তুমি কেমন ক'রে, বাঙলা, সে তুমি কেমন ক'রে
দিকে দিকে জন্ম দিচ্ছো পালেপালে শুয়োরকুকুর ?[৫৪]

কবি বাংলাদেশের দ্রুত পতনশীল নষ্ট সমাজ ব্যবস্থা দেখে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে 'চুপ করে থাকার সময়' কবিতায় বলেন—

আজ চুপ ক'রে থাকার সময়। চুপ ক'রে রেখে যেতে হবে
ঘাতকের শিল্পকলা। এই রক্ত, ছুরিকা, ও উন্মাদের অশ্লীল উৎসবে
হ'তে হবে নির্বাক দর্শক। দেখবো বান্ধব
অনুপস্থিত হ'য়ে গেছে, শুনে যাবো সংঘবদ্ধ দস্যুর কলরব
ঢেকে দিচ্ছে পাখির সঙ্গীত, জানি আমরণ
স'য়ে যেতে হবে রাজপথে শ্যামল শিখার মতো কন্যার বস্ত্রহরণ।
জানতে চাইবো না পুত্রের দ্বিখণ্ডিত লাশ
প'ড়ে আছে কোনখানে।[৫৫]

যার বাংলার প্রাণ। যার আমাদের গর্ব। যারা আমাদের ঐতিহ্য এই নষ্ট সময়ে তাদের আর সম্মান দেখানো হয় না। সম্মান পায় গর্দভেরা। কবি অতি নিঁখুতভাবে তার চিত্র তুলে ধরেছেন—'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়' কাব্যের 'পার্টিতে' কবিতায়।

স্কচের আভাস পেয়ে
অসুস্থ শরীরে এসেছেন শ্রীমধুসূদন, তাঁকে
কেউ চিনতে পারছে না। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন

নিঃসঙ্গ বঙ্কিম, একঝোপ দাড়ি সত্ত্বেও মহান
রবীন্দ্রনাথকে একটি বালিকাও চিনতে পারছে না।
শক্ত দাঁড়িয়ে আছেন সুধীন্দ্রনাথ, খুব কাঁপছেন
বুদ্ধদেব, নজরুল, একটি গাধাও তাদের চিনতে
পারছে না। রঙিন একটা গর্দভকে নিয়ে ব্যস্ত পাঁচটি
মাংসবতী গাভী, একটি ভাঁড়ের গায়ে ঝুলে আছে
গোটা দুই আধাপণ্য নারী, দশটি বালিকা আর
দুটি খোজা চুমো খায় নপুংসক নিমাইয়ের গালে।
পা ঘষছেন রবীন্দ্রনাথ। [৫৬]

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা বাঙালির প্রাণের শহর। যা কিছু আমাদের স্বপ্ন তা ঢাকাকে ঘিরেই। ঢাকা দেবে আশ্রয়, জীবিকা। তাই কাজের খোঁজে, প্রতিষ্ঠার লোভে গ্রামীণ যুবকেরা ঢাকায় আসে। বুকে কত আশা নিয়ে, কত সুন্দর মন ও সুন্দর চরিত্র নিয়ে কিশোর, যুবক, রাখাল, সবই আসে আনন্দে, প্রয়োজনে। কিন্তু কবির প্রশ্ন ঢাকা এখন কাদের নিয়ন্ত্রণে ? এই ঢাকা শহরেই আছে লম্পট, বদমাশ, প্রতারক, পতিতা, ভণ্ড, পণ্যনারী, জল্লাদ, টাউট, বাটপার, শয়তান প্রভৃতি। তাই কবির যুবকের উদ্দেশ্য বলেন—

তুমি বাঁশবনে ভুলে পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
তুমি ঢেউয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
তুমি মাঠের ছায়া উপলক্ষ ক'রে পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
নরকের হাতছানিতে ঝনবন ক'রে উঠেছে তোমার রক্ত
নরকের গালের আভায় ঝলমল ক'রে উঠেছে তোমার স্বপ্ন
নরকের ডাকে লেলিহান হ'য়ে উঠেছে তোমার সুর
তুমি পা বাড়িয়েছো ঢাকার দিকে
তুমি তোমার স্বপ্নকে মেলে দিয়েছো ভয়াবহ নরকের দিকে[৫৭]

আর—

ঢাকা এখন চার লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শো বদমাশের নগর
ঢাকা এখন তিন লাখ আশি হাজার লম্পটের নগর
ঢাকা এখন পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার তিন শো প্রতারকের নগর
ঢাকা এখন দুই লাখ বিশ হাজার পতিতার নগর
ঢাকা এখন দশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো ভণ্ডের নগর [৫৮]

তাই কবি বলেন—

যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে এক লাখ বিশ হাজার লুব্ধ পণ্যনারী
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে চার লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শো বদমাশ
যে দিক দিয়েই তুমি ঢোকো

তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে তিন লাখ আমি হাজার তিন শো প্রতারক
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার তিন শো জল্লাদ[৫৯]

তাকে আরো অভ্যর্থনা জানাবে, 'স্মিত হাস্যে শয়তানের মুখ', 'রাশি রাশি বিকৃত পোস্টার', 'দেয়ালের অর্থহীন অশ্লীল লিখন' প্রভৃতি।

হুমায়ুন আজাদ 'পেরোনের কিছু নেই' কাব্যে পিতা মাতার স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন—'আমাদের মা' কবিতায়। তিনি মাকে স্মরণ করতে গিয়ে আক্ষেপ করে লেখেন—

আমাদের মা ছিলো অশ্রুবিন্দু-দিনরাত টলমল করতো
আমাদের মা ছিলো বনফুলের পাপড়ি;—সারাদিন ঝ'রে পড়তো
আমাদের মা ছিলো ধানখেত-সোনা হয়ে দিকে দিকে বিছিয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো দুধভাত-তিন বেলা আমাদের পাতে ঘন হয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো ছোট্ট পুকুর-আমরা তাতে দিনরাত সাঁতার কাটতাম।[৬০]

কিন্তু এখন—

আমাদের মা আর বনফুলের পাপড়ি নয়, সারাদিন ঝ'রে পড়ে না
আমাদের মা আর ধানখেত নয়, সোনা হয়ে বিছিয়ে থাকে না
আমাদের মা আর দুধভাত নয়, আমরা আর দুধ ভাত পছন্দ করি না
আমাদের মা আর ছোট্ট পুকুর নয়, পুকুরে সাঁতার কাটতে আমরা কবে ভুলে গেছি
কিন্তু আমাদের মা আজো অশ্রুবিন্দু, গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত
আমাদের মা আজো টলমল করে।[৬১]

'প্রার্থনালয়' কবিতায় কবি সমাজ বাস্তবতার এক চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে খেলার মাঠ ছিল। নদীর ধারে 'পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার জায়গা ছিল' সুমদ্র ধারে নাচ-আর পানের জায়গা ছিল। এখন আর সেই অবকাশের জায়গা নেই। মসজিদে মন্দিরে ভরে গেছে। লোকের কাছে জানতে চাইলে কবি জবাব পান পৃথিবী পাপে ভরে গেছে। তাই সকলে প্রার্থনার রত।

আমি জিজ্ঞেস করি কেনো দিকে দিকে এতো প্রার্থনালয় ?
কেনো খেলার মাঠ নেই গ্রামে ?
কেনো নদীর ধারে নিষ্পলক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার স্থান নেই ?
কেনো জায়গা নেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বনের ?
কোনো জায়গা নেই নাচ আর পানের ?
তারা বলে পৃথিবী ভ'রে গেছে পাপে, আসমান থেকে জমিন ছেয়ে গেছে গুনাহয়
তাই আমাদের একমাত্র কাজ এখন শুধুই প্রার্থনা।[৬২]

সমাজ পঙ্কিলতায় ভরে গেছে, সব কিছুই এখন পঙ্কিল। কবি 'পেরোনের কিছুই নেই' কাব্যে এই পঙ্কিলতারই যেন চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'পঙ্কিল রাজহাঁস' কবিতায়—

ঘুমে জাগরণে দেখি বিশ্ব জুড়ে এক বিশাল পঙ্কের সরোবর।
কিছু নেই পঙ্ক ছাড়া, দিকে দিকে পঙ্কের বিস্তার; তার তীরে

দাঁড়িয়ে রয়েছি–অন্ধ, শূন্য থেকে বয়ে আসে ঠাণ্ডা কালো ঝড়
অশেষ পঙ্কের; পঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বে, বয়ে চলে চাঁদতারা ঘিরে।
কিছুই দেখি না পঙ্কর ছাড়া; আমার হৃৎপিণ্ডে, নষ্ট চোখের ভেতরে
ঢোকে পঙ্কের শীতল ঢেউ, শব্দহীন কাঁদে ভারী দূষিত বাতাস;
দেখি আমি: মাটি থেকে নীলিমা পর্যন্ত বন্ধ পঙ্কের সরোবরে
পাখা ঝাঁপটে ডুবে যচ্ছে আমার শুভ্র স্বপ্ন–আজ পঙ্কিল রাজহাঁস।[৬৩]

মানুষ সম্পর্কে কবি হুমায়ুন আজাদের চরম বিতৃষ্ণা, বিশেষ করে তাঁর পরিচিত জনদের প্রতি। তাদের প্রতি যেন তাঁর তীব্র ঘৃণাই প্রকাশ পেয়েছে লেখকের 'পেরোনোর কিছু নেই' (২০০৪) কাব্যের 'মানুষের সঙ্গ ছাড়া' কবিতায়। তাই তাঁর অকুন্ঠ উক্তি—

মানুষের সঙ্গ ছাড়া আর সব ভালো লাগে ; আমের শাখায়
কালো কাক, বারান্দায় ছোট্ট চড়ুই, শালিখের ঝাঁক,
আফ্রিকার অদ্ভুত গণ্ডার, নেকড়ে, হায়েনা, রাস্তার কোণায়
মলপরিতৃপ্ত নোংরা কুকুর, বহু দূরে ডাহুকের ডাক
সুখী করে, এই সব সুখ আছে ব'লে আজো বেঁচে আছি, এবং এখনো
বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাই হয়তো আত্মহত্যায় যাবো না কখনো।

মানুষ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না; শুধু ভাবি
এতো কুৎসিত কী ক'রে হলো এই জন্তুগুলো ? [৬৪]

তাঁর চোখে দেখা সমাজের মানুষগুলো দেখতে দেখতে তাদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা, মানুষের সঙ্গ নয়, কুকুর দেখেও তিনি মুগ্ধ হন—

মানুষের সঙ্গ ছাড়া আর সব ভালো লাগে; অতিশয় দূরে বেঁচে আছি,
পথের কুকুর দেখে মুগ্ধ হই, দেখি দূরে আজো ওড়ে মুখর মৌমাছি।[৬৫]

সমাজ বাস্তবতার এমন নিঁখুত চিত্র হুমায়ুন আজাদ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিভা তুলে আনতে পারেননি আমাদের কাব্যে। এই সমকাল সংলগ্নতার জন্যেই হুমায়ুন আজাদ সমকালের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাওয়ার যোগ্য।

তথ্যসূত্র :

১. চঞ্চল আশরাফ : আমার হুমায়ুন আজাদ– প্রাসঙ্গিক আলোচনা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১০।
২. হুমায়ুন আজাদ : কাব্যসমগ্র–আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২। পৃষ্ঠা : ১৯
৩. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ১৯
৪. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ২১
৫. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ২১-২২
৬. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ২২
৭. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ২৪
৮. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ৪২
৯. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ৪৩